১৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 SEP 1994 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

নিরক্ষর ও শিক্ষিত

ডঃ মুহম্মদ হাফিজুদ্দীন শেখ

নিরক্ষর অথচ শিক্ষিত লোক প্রায়ই দেখা যায়। অন্যদিকে শিক্ষিত মূর্খের সংখ্যাও বাংলাদেশে কম নয়। নিরক্ষর থাকলেই অশিক্ষিত থাকতে হবে এমন ধারণা ভুল। জন্মের পর থেকেই শিক্ষা শুরু হয় এবং তা মৃত্যু পর্যন্ত চলে। এ মর্মে একটি হাদিসে বলা হয়েছে 'শিক্ষা চলতে থাকে দোলনা থেকে কবর নাগাদ'। নিরক্ষর সাক্ষর হতে শুরু করে স্কুলে বা বাড়িতে পড়ালেখার মাধ্যমে। না-বুঝে মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেলেই শিক্ষিত লোক হওয়া যায় না।

সাক্ষরতা, শিক্ষাক্রম ও সংখ্যা-সমন্বিত পাঠ্যসূচী

কমপক্ষে কত বছর লেখাপড়া শিখলে সাক্ষরতা কার্যকর হয়? –এ প্রশ্নের গবেষণাভিত্তিক উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে অনুমান করতে পারি। একজন বয়স্ক লোক অথবা মেধাবী শিশু (নয়/দশ বছরের) সংখ্যা-সমন্বিত পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে এক বছরের মধ্যেই 'পড়া-শেখার স্তর' পার হয়ে 'পড়ে-শেখা'র স্তরে উন্নীত হতে পারে।

কথা মস্তিষ্কে যায় শোনার সময় কানের মাধ্যমে আর পড়ার সময় চোখের মাধ্যমে। কেউ যদি কোন বিষয় শুনে বুঝতে পারে অথচ তা পড়তে না পারে, তবে আমরা বুঝব সে পড়া শেখার স্তর শেষ করতে পারেনি অর্থাৎ তার অক্ষর ও যুক্তাক্ষরের জ্ঞান পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। বলা বাহুল্য, 'পড়া-শেখা'র স্তর অতিক্রম না করে কেউ 'পড়ে-শেখার' স্তরে পৌঁছুতে পারে না।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা অর্জন করতে হলে আগে জানা দরকার শিক্ষা কী। শিক্ষার শুরু আছে শেষ নেই। এম এ, এম এস-সি, এম কম এগুলো ডিগ্রি মাত্র। পাস করলে বিদ্বান হওয়া যায়, শিক্ষিত হওয়া যায় না। আসলে শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া। মানুষ জীবনে স্বভাবত যা করে বা যা তার করা উচিত তা আরও ভাল করে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালানোই হলো শিক্ষা।

বিষয়জ্ঞান

জন্মের পর থেকেই শিশুর পঞ্চেন্দ্রিয় সক্রিয় হয়। শব্দ পেলেই সে কান খাড়া করে, আকর্ষণীয় কিছু দেখলেই সে হাত বাড়িয়ে দেয়, ধরতে পারলে মুখে ভরে। এভাবেই সে তার পরিবেশকে জানতে চায়। অর্থাৎ এভাবেই তার জ্ঞানচর্চা শুরু হয়। পরিবেশের যে সব জিনিস সম্পর্কে তার ধারণা জন্মে সেইসব জিনিস সম্পর্কে সে কিছু বিষয়জ্ঞান পেল বলা যেতে পারে।

তার জ্ঞানচর্চার জন্য যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে তেমনি আছে সামাজিক পরিবেশ। শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটে একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে। একদিন সে মাকেও চিনত না বা মা সম্পর্কে কোন জ্ঞানও তার ছিল না। অথচ চার পাঁচ বছর বয়সে সে দাদা দাদী, নানা নানী অনেককেই চেনে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে আত্মপ্রকাশও করে।

'ও কাঁদে, আমি কাঁদি না, ও পারে না, আমি পারি' ইত্যাদি কথা শুনিয়ে শিশু অন্যের চেয়ে যে ভাল তা বুঝাতে চায়। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানব শিশুর জন্মগত জ্ঞানচর্চার এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সে যাতে পড়ালেখা শিখতে ও ব্যবহার করতে পারে তার উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি বইপত্র ও শিক্ষণ উপকরণ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

শিশু তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা বুদ্ধি ও আবেগ দিয়ে প্রকাশের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা করে এবং ঐ প্রক্রিয়াতে তার বুদ্ধি, ভাষা ও জ্ঞান ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়।

সংখ্যাজ্ঞান

সংখ্যাজ্ঞানের একদিকে আছে বিষয়জ্ঞান আর অন্যদিকে ভাষাজ্ঞান। পরিমাণে কোন্‌টা বেশি, কোন্‌টা কম, কোন্‌টা ভারী, কোন্‌টা হালকা, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট এই সব ধারণাকে কেন্দ্র করেই সংখ্যার ধারণা অর্থাৎ অংক বিষয়ে জ্ঞান। গণিতশাস্ত্র নানা রকম মাপের মানদণ্ডে ১,২,৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে পরিমাণের পার্থক্য সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করে এবং এভাবেই এসব ধারণা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে অন্যের নিকট বোধগম্য হয়।

আমি দু'টা নেব, একটা নেব না বা ওকে একটা দেব দু'টা দেব না ইত্যাদি কথা যখন শিশু বলে তখন আমরা বুঝি যে, তার ১ ও ২ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে। বয়স বাড়ার সংগে তার সংখ্যা-জ্ঞান বাড়ে।

আমরা জানি ব্যক্তির অভিজ্ঞতার অনেকখানি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে তার স্মৃতিভাণ্ডারে জমা থাকে। সে কানের মাধ্যমে তার সংগে সংযোগ সাধন করে। কেউ বললে সে শোনে এবং তা বুঝতে পারে। কিন্তু ঐ একই কথা লিখে দিলে সে তার সংগে সংযোগ সাধন করতে পারে না। অক্ষরজ্ঞান অর্জন করলেই সে তা পারবে।

ভাষাজ্ঞান

অক্ষরজ্ঞান ভাষাজ্ঞানেরই অংশ। ভাষার সাথে চিন্তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। চিন্তাক্রিয়া ছাড়া শুনে শেখবার ক্ষমতা তেমন কার্যকর হয় না। সরাসরি অর্থপূর্ণ কিছু বলার পেছনে সক্রিয় চিন্তা কাজ করে। পঠনও একরম সক্রিয় চিন্তার ফসল। লেখকও অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তবে তার মনের ভাব প্রকাশ করেন। মূলকথা সার্থকভাবে ভাষা ব্যবহার করতে তথা অর্থপূর্ণভাবে শুনতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে শেখার মাধ্যমে আমাদের চিন্তা ও কল্পনা শক্তিকে অনেক বাড়াতে পারি।

আমরা দু'ভাবে ভাষা প্রকাশ করে থাকি- মৌখিকভাবে আর লিখিতভাবে। ভাষার মৌখিক ব্যবহার করতে শেখার গুরুত্ব কম নয় বরং অনেক বেশি। ব্যক্তির যোগ্যতা বিচারের এটা একটা বড় মাপকাঠি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলার ধরন দেখেই বক্তার জ্ঞানের পরিমাপ আন্দাজ করা যায়। সমাজের উপকারে আসতে হলে শুধু নিজে বুঝলেই চলে না, অন্যদেরও বোঝানো দরকার হয়। যে তার মনের কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারে না সে লোকের চোখে অযোগ্য প্রতিপন্ন হয়। সমবেত প্রচেষ্টা মূলক কাজে তার ডাক পড়ে না। নিজের মধ্যেই সে সীমাবদ্ধ থাকে। সামাজিক জীবন তার সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে না।

ভাষার মৌখিক ব্যবহার ঠিকমত শিখতে না পারলে একদিকে আমরা যেমন সামাজিক জীবনে সাফল্য লাভ করতে বাধা পাই তেমনি বাধা পাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনেও। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ। ছেলেমেয়ে, পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন দেশবাসী ও মানবসমাজ সকলেই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সহায়ক হতে পারে। ভাবের আদান-প্রদান সুষ্ঠুভাবে যত বেশি লোকের সাথে আমরা করতে পারব তত বেশি প্রসারতা লাভ করবে আমাদের জ্ঞান।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশে মাতৃভাষা শেখানো হয় মৌখিক প্রকাশের ওপর প্রয়োজনীয় জোর দিয়ে। কারণ, ভাষাবিদরা বলে থাকেন যে, ভাষা মূলত মৌখিক। ঐ ভাষাকেই আমরা লেখার মাধ্যমে দৃশ্যমান প্রতীকের রূপ দিই মাত্র।

বাংলা শেখার সময় মৌখিক ভাষার ওপর যথাযথ গুরুত্ব না দেবার ফলে আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে গুছিয়ে লিখতে পারে, তেমন গুছিয়ে বলতে পারে না। বলার অভ্যাস যথাযথ পরিমাণে না করে, শুধু লেখার অভ্যাস করলে এমনটি হতে বাধ্য।

দুই হাজার সালের মধ্যে অর্থাৎ আজ ১৯৯৪ সাল থেকে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৬৫%-এ উন্নীত করতে চাই। এ কারণে আমাদের শিশু শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা খাতে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নামে একটা ব্যবস্থার সংযোজন ঘটেছে। সবই ভাল কথা। তবে শিক্ষিতের নামে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ালে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লক্ষ্য করা যায়, গ্রামের স্কুল ত্যাগী অল্প লেখাপড়া জানা ছেলেরা প্রায়ই সহজে চাষের কাজে যোগদান করতে পারে না, অধিকাংশ সময় খেলাধূলা করে কাটাতে চায়। বাপ-মা এদের নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েন। এসব ছেলের বয়স ৯ থেকে ১৭/১৮ বছর। এদের অধিকাংশ স্কুলে ফেল করা ছেলে। এরা যে সমাজে অযোগ্য নাগরিক হয় তার কারণ আমাদের পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা।

আমাদের শিক্ষা পরীক্ষাকেন্দ্রিকও বটে। স্কুলের পরীক্ষা পদ্ধতি এমন ত্রুটিপূর্ণ যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কে কি বলেছেন তার ব্যাখ্যা এবং সারাংশ লিখে দিলেই ভাল নম্বর পেয়ে পাস করা যায়। এভাবে চলতে চলতে আমরা দু'রকমের মানুষ সৃষ্টি করে চলেছি। নিরক্ষরের দল নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে অথচ বলছে না কিছুই, তাদেরও যে ব্যক্তিগত সম্পর্কে বেশ কিছু বলার আছে এ ধারণাও তাদের নেই। অপরপক্ষে যাদের জ্ঞান বইপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নিজেদের সত্যিকারের কিছুই বলবার বা লেখবার নেই তারাই বলছে এবং লিখছে। ফলে প্রায় ক্ষেত্রে কাজ করছে একদল লোক কিন্তু কথা বলছে অন্যদল। এই অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। স্কুলের শিক্ষা ও বয়স্ক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রমে এমন সব পরিবর্তন আনতে হবে যা আমাদের সামগ্রিক জীবনের মানোন্নয়নে সহায়ক হয়।

অভিজ্ঞতা ও বই পড়া

বইপুস্তক মুখস্থ করলেই জ্ঞান বাড়ে না, জ্ঞান বাড়ে অভিজ্ঞতার ফলে এবং অভিজ্ঞতা আসে হাতেকলমে কাজ করে। উন্নত বিশ্বে ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজ করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করে; আবার বইও পড়ে প্রচুর। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকমের বই পড়ে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, শিক্ষার্জন শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রক্রিয়াতে চলে। অন্যের কাছ থেকে সে যা শোনে বা বই পড়ে যা জানে তা নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে যথা সম্ভব বুঝে নেয়।

স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা তেমন কিছু পায় না। তাই লক্ষ্য করা যায় ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্য বই পড়ছে কিন্তু নিজের এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ভাল করার জন্যে সচেষ্ট হচ্ছে না। সমাজপাঠ পড়ছে কিন্তু সকলের সাথে মিলে মিশে গঠনমূলক কাজে অংশ নিচ্ছে না, নানান রকমের সমস্যামূলক অংকের অনুশীলন করছে কিন্তু নিজের পাড়া বা গ্রামের জনসমস্যা ও উৎপাদনকে কেন্দ্র করে কোন বাস্তব হিসাব-নিকাশ করতে শিখছে না।

স্কুলের শিক্ষার এই অবাঞ্ছিত দিকটির পরিবর্তনের জন্য চতুর্থ শ্রেণী হতে গ্রামোন্নয়নমূলক শিক্ষা-ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এই সব ইউনিট বা প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে ছেলেমেয়েরা গ্রামের লোকজনের সংখ্যা, জমিজমার পরিমাণ, রাস্তার অবস্থা, গরুবাছুর, হাঁসমুরগী, গাছপালা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং ঐসব জিনিসের উন্নয়ন সাধনের জন্য পুস্তক-পুস্তিকা পড়বে, আলাপ-আলোচনা করবে, রিপোর্ট লিখবে এবং নিজেদের চিন্তা-ভাবনা বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করবে। এজন্য গ্রামের নিরক্ষর জনগণের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।

গ্রামকে কেন্দ্র করে চলবে যেমন উন্নয়নমূলক শিক্ষা তেমনি চলবে পরিবারকে কেন্দ্র করে জীবন যাপনের মানোন্নয়নমূলক শিক্ষা। শিশুকে পড়ালেখা শেখার ব্যাপারে মায়ের ভূমিকা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হতে পারে না। অথচ বাংলাদেশের অধিকাংশ মা নিরক্ষর। এই নিরক্ষর মায়েরাও কিছু ট্রেনিং-এর পর 'শব্দ ভাঙ্গা পদ্ধতিতে' বইটি ব্যবহার করে একদিক দিয়ে নিজেরা সাক্ষরতা অর্জন করতে পারবে অন্যদিকে নিজের শিশুকে পড়ালেখা শিখতে সাহায্য করতে পারবে।

বাংলা পাঠ্যবই শিশুদের ও বয়স্কদের পৃথকভাবে সংখ্যা ও প্রথম পর্যায়ে যোগ, বিয়োগ এমন কি গুণ, ভাগ শেখার কাজ একই পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে মা- বাবা শিশুদের সংখ্যাজ্ঞান দেবার কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

গ্রামের অনেক পরিবার লোকসংখ্যার চাপে পড়ে এবং নদীর ভাঙন, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শহরের দিকে চলে আসছে রুজি-রোজগার উপার্জনের আশায়। এসব পরিবারের মেয়েরা গার্মেন্টসে কাজ যোগাড় করে নিচ্ছে। শিক্ষিত কিছু ছেলে আবার বিদেশে চলে যাচ্ছে রোজগারের আশায়। উচ্চ শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিদেশে চলে যাচ্ছে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। এভাবে বর্তমানে আমাদের পরিবারের যৌথ পরিবার ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু ভাঙা-গড়ার কাজ চলছে। ঢাকা শহরে ধানমণ্ডি, গুলশানের মতো আভিজাত এলাকায় বেশ কিছু পরিবারে বুড়ো বাপ-মা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে চাকরিজীবী অনেক পরিবার মা-বাপকে গ্রামের বাড়িতে রেখে নিজেরা শহরে কোন রকমে জীবনযাপন করছে। চাকরির কারণে হয়তো স্বামী-স্ত্রী আটটায় বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কাজের মেয়ের নিকট ছোট শিশুকে রেখে। দৈনন্দিন জীবন তেমন সুখে কাটাতে পারছে না অধিকাংশ পরিবার। শিক্ষার সুফল পেতে হলে প্রত্যেকটি পরিবারকে সুখী পরিবাররূপে গড়ে তুলতে হবে। আদর্শ পরিবারের লোকসংখ্যা থাকবে ৫ বা ৬ জন। বাড়ির কর্তা এবং তার স্ত্রী- এই দু' জন। ছেলে হোক মেয়ে হোক দু' জন শিশু থাকবে। কারণ, কমপক্ষে দু'জন শিশু লাগবে আনন্দে দিন কাটানোর জন্য। তাদের দাদা-দাদী বা নানা-নানী যে কোন একপক্ষের যারা বেঁচে আছেন এবং ছেলে মেয়ের সংসারে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চান।

মনে রাখবেন শিশু ও দাদা-দাদী বা নানা-নানী পরস্পরের জন্য রহমতস্বরূপ। এ ধরনের যৌথ পরিবারের ঐতিহ্য বাংলাদেশে আছে। এই ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিনগুলোতে আমরা আমাদের শিশু ও বুড়ো-বুড়িদের নিরাপদ এবং আনন্দময় আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তুলবো। প্রত্যেকটি পরিবার হবে এক একটি সুখের নীড় এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাস্থল।

[লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এ্যাণ্ড রিসার্চ-এর অধ্যাপক]